ভারতীয় বস্তুবাদ ও পরমাণুবাদ

বিরঞ্জন রায়

এই প্রবন্ধে সংক্ষেপে ভারতীয় দর্শনের পুনপাঠ করে তার বিভিন্ন প্রকাশিত ও প্রচ্ছন্ন দিকগুলো সামনে আনা হয়েছে। দর্শনের বিভিন্ন ধারার মধ্যে বিতর্ক, পার্থক্যগুলো উল্লেখ করে লেখক এর শক্তি ও দুর্বলতা নির্দেশ করেছেন। একইসঙ্গে আমাদের সমাজে সংস্কৃতিতে তার প্রভাবও চিহ্নিত করেছেন। দীর্ঘ বলে এই লেখা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হবে। এই বিষয়ে আলোচনা বিতর্ক সবসময়ই গ্রহণযোগ্য।

ভূমিকা

গ্রীস ও ভারতে সমান্তরাল চিন্তাধারা বিকাশের সাক্ষ্য ইতিহাস ধরে রেখেছে। ৩২৭-৩২৫ খ্রিপূ আলেকজান্দ্রস এর ভারত অভিযান এই দুই সভ্যতার মধ্যে সরাসরি দীর্ঘস্থায়ী যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করে। এর আগে এ দুই সভ্যতার যোগাযোগটি ছিল পরোক্ষ, পারস্য সাম্রাজ্যের মাধ্যমে। কোন্ ক্ষেত্রে এ প্রভাবের মাত্রাটি কেমন এ নিয়ে সর্বজনসম্মত কোন মত নেই। একই রকম পরিবেশে বিভিন্ন স্থানে বা একই স্থানে বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে একই রকম ভাবধারার উদ্ভব হয়। এর প্রচুর নজির ইতিহাসে রয়েছে।

বর্তমান প্রবন্ধটিতে আমরা নজর দেব ভারত উপমহাদেশে গ্রীক এপিকুরস দর্শনের চিন্তাধারার সমান্তরাল বিকাশের দিকে। এপিকুরীয় দর্শন এবং প্রভাবের মর্মবস্তু বস্তুবাদ ও পরমাণুবাদ। এখানে ভারতীয় দর্শনে বস্তুবাদ ও পরমাণুবাদের পরিচয় দেব। দার্শনিক বস্তুবাদের মূল প্রত্যয় তিনটি। সত্তাতাত্ত্বিক (ontological) বিবেচনায় প্রাণহীন অচেতন পদার্থ থেকেই প্রাণ এবং চেতনার উদ্ভব। সামাজিক বাস্তবতাই সামাজিক চেতনার জন্ম দেয়। জ্ঞানতাত্ত্বিক (epistemological) বিবেচনায়, জ্ঞান অর্জন সক্রিয় প্রক্রিয়া। এর প্রাথমিক উৎস ইন্দ্রিয়-সংবেদন। ইন্দ্রিয়-সংবেদন চেতনা বহির্ভূত জগৎকে চেতনায় প্রতিফলিত করে। চেতনার বাইরে সে জগতের স্বাধীন অস্তিত্ব রয়েছে। প্রায়োগিক বিবেচনায়, সমাজবদ্ধ সক্রিয় মানুষ সামাজিক এবং প্রাকৃতিক পরিবেশের নিয়ম জেনে এবং মেনে এর পরিবর্তন সাধনে সক্ষম। অবশ্য এ পরিচয়টি বিকশিত বস্তুবাদের। বস্তুবাদের প্রাচীন রূপগুলোতে উপরে বর্ণিত সব লক্ষণের দেখা মিলে না।

একথা বহুল প্রচারিত এবং প্রচলিত, ভারতীয় দর্শন অধ্যাত্মবাদী (ভাববাদী) কিংবা রহস্যবাদী। খ্রিস্ট্রীয় দ্বাদশ শতাব্দী থেকে ভারতীয় দর্শনের প্রাধান্যশীল ধারা অধ্যাত্মবাদী কিংবা রহস্যবাদী। একই সঙ্গে এ কালপর্ব ভারতীয় সংস্কৃতির নির্জিবতা ও স্থবিরতার কালও বটে। ভারতীয় সংস্কৃতির সজীবতার কালে উপর্যুক্ত দুটি দার্শনিক ধারা ভারতীয় দর্শনের অনেকগুলো ধারার দুটি প্রতিদ্বন্দ্বী ধারা ছিল মাত্র। একমাত্র চার্বাক ধারাটি ঘোষিতভাবে বস্তুবাদী হলেও অন্য ধারারগুলোর মধ্যেও বস্তুবাদের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য/উপাদান প্রচ্ছন্ন বা প্রকটভাবে বর্তমান ছিল। তাই আমরা ভারতীয় বস্তুবাদ প্রসঙ্গে চার্বাক ধারা ছাড়াও অন্যান্য ধারার বস্তুবাদী বৈশিষ্ট্য/উপাদান গুলোর একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেব। পরমাণুবাদ বস্তুবাদের একটি রূপ। চার্বাক পরমাণুবাদী নয়। কিন্তু ভারতীয় দর্শনের অনেকগুলি ধারাই পরমাণুবাদকে বিকশিত করেছে। ভারতীয় বস্তুবাদের আলোচনার পর আমরা আলোচনা করব ভারতীয় পরমাণুবাদ নিয়ে।

ভারতীয় দর্শনের কয়েকটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য

গ্রীক দর্শনের সঙ্গে গ্রীক ধর্মের সম্পর্কটি ওতপ্রোত নয়। পক্ষান্তরে ভারতীয় দর্শনের কতক ধারার উৎপত্তিই ধর্মের অঙ্গ হিসাবে। যেমন জৈন দর্শন, বৌদ্ধ দর্শন, মীমাংসা ও বেদান্ত দর্শন। অন্য ধারারগুলোর মূল আলোচ্য ধর্ম না হলেও সেসবকে ধর্মের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। যেমন সাংখ্য-যোগ, ন্যায়-বৈশেষিক। একমাত্র ব্যতিক্রম হলো লোকায়ত বা চার্বাক দর্শন। তাই ভারতীয় দর্শনের আলোচনায় ভারতীয় ধর্মের আলোচনা অবশ্য প্রয়োজনীয়।

পশ্চিম এশিয়ায় উদ্ভূত ধর্মসমূহের (ইহুদী, খ্রিস্টান, ইসলাম) সঙ্গে ভারতে উদ্ভূত ধর্ম সমূহের (হিন্দু, জৈন, বৌদ্ধ) কিছু গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য রয়েছে। প্রথমোক্ত ধর্মসমূহে ঈশ্বরের অবস্থান কেন্দ্রীয়। অন্যদিকে জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মে ঈশ্বরের স্বীকৃতি নেই। ঈশ্বরে বিশ্বাস না করেও হিন্দু থাকা সম্ভব। ভারতে উদ্ভূত ধর্ম সমূহের সাধারণ কেন্দ্রীয় বিষয় জন্মান্তর ও কর্মবাদ। অর্থাৎ আত্মার পুনর্জন্ম হয় এবং পূর্বজন্মের কৃতকর্মের ফল অনুযায়ী পরবর্তী জন্ম নির্ধারিত হয়। বৌদ্ধরা অমর আত্মায় বিশ্বাসী নন। তারা বিশ্বাস করেন, কর্মফলের বাহক চেতনা বা 'আলয় বিজ্ঞান'। তাঁদের মতে জগতের প্রতিটি বিষয়ের মতো চেতনাও প্রতিমুহূর্তেই ধ্বংস হচ্ছে এবং নতুন করে জন্ম নিচ্ছে। কিন্তু এতে প্রবাহের একটি ধারাবাহিকতা আছে। এ চেতনার জন্মান্তরও ঘটে। তাই তারা হিন্দু ও জৈনদের মতো অমর আত্মায় বিশ্বাসী না হলেও, এতে ব্যক্তির জন্ম-জন্মান্তরে কর্মফল ভোগে বাধা নেই। এসব ধর্মের অন্য সাধারণ বৈশিষ্ট্যটি, সব ধর্মেই জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য হিসাবে নির্ধারিত হয়েছে, এই পুনর্জন্মের চক্র থেকে মুক্ত হওয়া। এ চূড়ান্ত মুক্তির স্বরূপটি কী, এ নিয়ে বিভিন্ন ধর্মে এবং দার্শনিক ধারায় মতবিরোধ রয়েছে। এটিকে কেউ বলেন মোক্ষ, কেউ অপবর্গ, কেউ কৈবল্য, কেউবা নির্বাণ। কিন্তু এতে 'জীবন কাঙ্ক্ষিত নয়' এ মূল সুরটি ব্যহত হয় না।

হিন্দু ঐতিহ্যে ভারতীয় দর্শনসমূহকে 'আস্তিক' ও 'নাস্তিক' এ দুভাগে ভাগ করা হয়। এ শব্দ দুটির সঙ্গে ঈশ্বর বিশ্বাসের সম্পর্ক নেই। যে দর্শন 'বেদ' এর অভ্রান্ততায় বিশ্বাস করে তাই আস্তিক দর্শন। যে দর্শন তা করেনা তা নাস্তিক দর্শন।

হিন্দু ঐতিহ্যে ভারতীয় দর্শনসমূহকে 'আস্তিক' ও 'নাস্তিক' এ দুভাগে ভাগ করা হয়। এ শব্দ দুটির সঙ্গে ঈশ্বর বিশ্বাসের সম্পর্ক নেই। যে দর্শন 'বেদ' এর অভ্রান্ততায় বিশ্বাস করে তাই আস্তিক দর্শন। যে দর্শন তা করেনা তা নাস্তিক দর্শন। বেদ এর অন্য নাম 'শ্রুতি'। অর্থাৎ যা শোনে মনে রাখতে হয়, যার লিখিত রূপ নেই। একমাত্র ব্রাহ্মণরাই ছিলেন বেদ অধ্যয়নের অধিকারী। সমাজ চালিত হতো যে শাস্ত্র দ্বারা তার নাম 'স্মৃতি'। যদিও শ্রুতি এবং স্মৃতির বিষয়বস্তু ভিন্ন, কিন্তু বলা হয় শ্রুতি থেকেই স্মৃতি জাত। শ্রুতি যেহেতু কেবল ব্রাহ্মণরাই জানেন, তাই শ্রুতি এবং স্মৃতির মিল অমিলের ব্যাপারে প্রশ্ন করার উপায় ছিল না। কাজেই বেদকে মানার বাস্তব অর্থ দাঁড়াল ব্রাহ্মণকে মানা এবং বর্ণপ্রথাকে মানা।

ভারতে সচেতন দার্শনিক চিন্তার প্রথম উন্মেষ প্রাচীন উপনিষদগুলোর কালে (৭০০-৫০০ খ্রিপূ.), উপনিষদ রচনা বুদ্ধের পরিনির্বানের (৪৮৩ খ্রিপূ.) পরও কিছুকাল চলতে থাকে। তারপর দার্শনিক 'সূত্র'র যুগ (খ্রিপূ. ২০০-২০০ খ্রি.)। সে সময়ই দার্শনিক ধারাগুলো রূপ নেয়। তারপর থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত সে সব ধারাগুলোর ভাষ্য, ব্যাখ্যা, টীকা, কারিকা (সহজ পরিচিতি) রচনার কাজ চলেছে। স্বতন্ত্র কোন দার্শনিক ধারা আর গড়ে উঠেনি। অবশ্য এর মানে এই নয় যে, 'সূত্র'র কাল থেকে দার্শনিক চিন্তাধারা বিকশিত হয় নি। একই দার্শনিক ধারার বিভিন্ন ভাষ্য অনেক সময় নতুন দার্শনিক ধারার মতোই। এসবে আমরা চিন্তা-পদ্ধতির বিকাশ যেমন লক্ষ্য করি, তেমনি পরিবর্তন লক্ষ্য করি তর্কের বিষয় বস্তুতেও। এসব ভারতে বস্তুগত ও ভাবগত সংস্কৃতি উন্নয়নের পরিচয়বাহী। এছাড়া দার্শনিক বিকাশের আর একটি বড় কারণ দার্শনিক ধারাগুলোর পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা। দার্শনিক চিন্তার বিকাশ ঘটলেও নতুন কোন দার্শনিক ধারা সূচিত হল না কেন? প্রশ্নটির উত্তর পেতে আমাদেরকে দর্শনের ক্ষেত্রের বাইরে বৃহত্তর সামাজিক-সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে নজর দিতে হবে।

ভারতীয় দর্শনের আর্থসামাজিক পটভূমি

সময়ের সঙ্গে ভারতীয় সমাজ এর অর্থনীতি-সংস্কৃতি সহ পরিবর্তিত হয়েছে। তবে এ পরিবর্তনের ছন্দ ধীর। ইউরোপীয় ইতিহাসের নিরিখে সে পরিবর্তন প্রায় লক্ষ্যযোগ্য নয়। তাই ভারতীয় জীবনে পরিবর্তনের পাশাপাশি ধারাবাহিকতার ভূমিকাটি গুরুত্বপূর্ণ। ধারাবাহিকতার অন্যতম প্রধান লক্ষণ কৃষির উপর প্রাথমিক নির্ভরতা। ভারতীয় কৃষি অর্থনীতি সেই সুদূর অতীত থেকে আধুনিক আমল পর্যন্ত বর্ষার খামখেয়ালীপনার উপর নির্ভরশীল। কৃষির উপকরণ ও পদ্ধতিতে নতুন নতুন প্রক্রিয়া ও পরীক্ষা নিরীক্ষার অভাব ভারতীয় কৃষি অর্থনীতিকে প্রাচীন যুগে অনেকাংশেই অনিশ্চিত রেখে দিয়েছিল। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল জলসেচ ও তার সংরক্ষণের সমস্যা।

জাতিবর্ণে বিভক্তি ভারতীয় সমাজের অনন্য বৈশিষ্ট্য। এ জাতিবর্ণ প্রথার মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তি জন্মান্তর ও কর্মবাদ। দর্শনের নিশ্চিদ্র যুক্তি ও অযৌক্তিক ধর্মীয় বিশ্বাস, এ দুয়ের মাধ্যমেই জন্মান্তর ও কর্মবাদকে ভারতীয় সমাজ-মানসে বদ্ধমূল করা হয়েছে।

জাতিবর্ণে বিভক্তি ভারতীয় সমাজের অনন্য বৈশিষ্ট্য। এ জাতিবর্ণ প্রথার মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তি জন্মান্তর ও কর্মবাদ। দর্শনের নিশ্চিদ্র যুক্তি ও অযৌক্তিক ধর্মীয় বিশ্বাস, এ দুয়ের মাধ্যমেই জন্মান্তর ও কর্মবাদকে ভারতীয় সমাজ-মানসে বদ্ধমূল করা হয়েছে। অর্থনৈতিক শ্রেণিকে জাতিবর্ণের কাঠামোয় রূপান্তরিত-করণের বিষয়টি, বিশ্বইতিহাসে ব্রাহ্মণ্যবাদের অনন্য উদ্ভাবন। জাতিবর্ণ ব্যবস্থায় সংগঠিত সমাজ দ্রুত অর্থনৈতিক পরিবর্তনের পরিপন্থী। যে অর্থনৈতিক বিকাশ প্রাচীন ভারতে দেখা যায় তার প্রায় সব সুযোগ সুবিধাই ভোগ করত দুই উচ্চতর বর্ণভুক্ত ব্যক্তিরা: ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়রা। বাণিজ্যজাত অর্থ বণিকদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি ঘটাত। কিন্তু বণিকদেরকে সামাজিক মর্যাদা দেয়া হত না। গৌতম বুদ্ধের সময়ে এবং পরবর্তী মৌর্যযুগে অবস্থার কিছুটা পরিবর্তন হয়েছিল। সে সময় শ্রেষ্ঠী বা বড় বণিকরা সামাজিক মর্যাদা ভোগ করতেন। তাই কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্রে 'বৈদেহক' বা বণিককে রাষ্ট্রের পক্ষে 'কন্টক' বলে ভাবা হয়নি। কিন্তু পরবর্তি কালে এ অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। তাই দেখি মনুর ধর্মশাস্ত্রে বণিকের অন্যতম পরিচয় 'প্রকাশ্যতস্কর'। শূদ্রসহ সমাজের বিভিন্ন ধনোৎপাদক সম্প্রদায়কে অত্যন্ত হেয়ভাবে বিচার করা জাতিবর্ণ প্রথার অন্যতম চিরাচরিত লক্ষণ। ব্রাহ্মণ্য মতাদর্শে বৈশ্য-শূদ্রের উত্থান কখনোই সুনজরে দেখা হয়নি। ভারতীয় সমাজ কেবলমাত্র চারটি বর্ণে বিভক্ত ছিল না। চারটি বর্ণের অস্তিত্ব কার্যত তত্ত্বেই সীমাবদ্ধ ছিল। মূল সামাজিক ভাগ ছিল জাতি। অধিকাংশ জাতি ছিল নির্দিষ্ট বৃত্তিধারী।

সামাজিক গতিময়তা শাস্ত্রের অনুমোদন না পেলেও বাস্তবে যে ঘটত, তার প্রমাণ হাজির করা শক্ত নয়। কিন্তু অন্ত্যজ বা সমাজের নিম্নতম পর্যায়ভুক্ত ব্যক্তির পক্ষে উচ্চতর সামাজিক মর্যাদা লাভ কার্যত অসম্ভব ছিল। ব্রাহ্মণ্য ঐতিহ্যবাহী জাতিবর্ণ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ও বিশেষত ব্রাহ্মণের আধিপত্যের বিরুদ্ধে বুদ্ধসহ একাধিক প্রাচীন চিন্তানায়ক ও ধর্মপ্রবর্তক প্রতিবাদী আন্দোলন চালিয়েছিলেন। কিন্তু জাতিভেদ প্রথার বিলোপ ও উচ্চতর জাতির দ্বারা অন্ত্যজদের পীড়ন কোনটিই বন্ধ হয়নি। জাতিবর্ণ প্রথা ভারতে সামাজিক অসাম্য ও শোষণকে চিরস্থায়ী রূপ দিয়েছিল। কিন্তু যেহেতু জাতিগুলি সবমময়ই নির্দিষ্ট বৃত্তিধারী ছিল, ফলে একটি জাতির অন্তর্গত বৃত্তিজীবী মানুষ এক ধরনের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা পেতেন। চণ্ডাল নিঃসন্দেহে হীনতম এক বৃত্তিতে নিয়োজিত ছিলেন এবং এই অবস্থা থেকে তার কোন উদ্ধারের আশা প্রায় ছিল না। কিন্তু চণ্ডালের বৃত্তি যেহেতু অন্য কোনও জাতির দ্বারা করণীয় নয় তাই চণ্ডালের বৃত্তি ছিল প্রায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা রহিত। একটি কৃষিভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থায় জাতিবর্ণ প্রথা ন্যূনতম অর্থনৈতিক সুযোগ ও উপায়ের পথ দেখাত। সেই কারণে নিম্নতম জাতির লোকেরা ও কৌম গোষ্ঠীভুক্ত মানুষ এই প্রথার প্রতি কিছুটা আকর্ষণ সম্ভবত বোধ করতেন। প্রাচীন ভারতের সামাজিক অর্থনৈতিক জীবনযাত্রায় ন্যূনতম অর্থনৈতিক নিরাপত্তার বিকল্প কোনও ব্যবস্থা বা সম্ভাবনা কোনও প্রতিবাদী আন্দোলন থেকে বেরিয়ে আসেনি। ফলে অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনে পরিবর্তন যতটুকু এল তা ঘটেছিল মন্থর গতিতে। আমূল পরিবর্তনের ক্ষেত্র তাই প্রাচীন ভারতের আর্থ-সামাজিক অবস্থা-ব্যবস্থায় তৈরী হয়নি। সময়ের সাথে ভারতীয় দর্শনের উন্নয়ন ঘটলেও এটি যে তার পুরাতন কাঠামো ভেঙ্গে বেরিয়ে আসতে পারেনি এটিই তার কারণ।

ভারতীয় দর্শনে বস্তুবাদ

উপনিষদেই আমরা প্রথম দার্শনিক চিন্তাধারার প্রথম পরিচয় পাই। অবশ্য তখনও তা পুরাদস্তুর দার্শনিক হয়ে উঠেনি। উপনিষদের প্রধান সুরটি ভাববাদী। কিন্তু সেখানে একটি বস্তুবাদী সুরও বর্তমান। উপনিষদের ভাববাদী ধারাটির বিকাশ ঘটে বেদান্ত দর্শনে। দ্বাদশ শতাব্দীর পর এটিই হয়ে দাঁড়ায় প্রাধান্যশীল দর্শন। বৈদান্তিকদের প্রচেষ্টায় আধুনিক ভারতে এবং ভারতের বাইরে বেদান্ত এবং ভারতীয় দর্শন সমীকৃত হয়ে যায়। অদ্বৈত, দ্বৈতাদ্বৈত, দ্বৈত এসবই বেদান্তের পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী ভাষ্য। কিন্তু সব ভাষ্যেই ব্রহ্ম যে একমাত্র কিংবা মূল বিষয় তাই প্রতিপাদন করা হয়। তাই এটি চূড়ান্ত ভাববাদী দর্শন। এ দর্শনে জ্ঞান লাভের সবচেয়ে নিশ্চিত উপায় 'শ্রুতি' বা আপ্তবাক্য।

বৈদিক ঐতিহ্যের অন্য দার্শনিক ধারাটি মীমাংসা দর্শন। বৈদিক যুগের পরবর্তী যুগে বৈদিক যাগযজ্ঞকে যুক্তিগ্রাহ্য করাই এ দর্শনের উদ্দেশ্য। এ দর্শন মতে বেদ অনাদি এবং স্বয়ম্ভু। অর্থাৎ বেদ মানুষ কর্তৃক তো নয়ই, এমনকি ঈশ্বর কর্তৃকও রচিত নয়। একমাত্র বেদ বিহিত যজ্ঞ করেই স্বর্গলাভ করা সম্ভব। তাই এটিও একটি ভাববাদী দর্শন। কিন্তু ঈশ্বরের বিপরীতে বেদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে তা ঈশ্বরবাদ বিরোধী যুক্তি বিকশিত করেছে। পাশাপাশি বৈদিক যজ্ঞ ক্রিয়াকে সমর্থন করতে গিয়ে বৈদান্তিকদের 'জগৎ মায়া মাত্র' এ যুক্তির বিপরীতে জগতের বাস্তবতার সমর্থনে যুক্তি উদ্ভাবন করেছে। এসব যুক্তি বাস্তুবাদের (realism) সমর্থক। মীমাংসা দর্শনের চূড়ান্ত লক্ষ্য 'স্বর্গলাভ'। সে মতে নিত্য সুখই স্বর্গ। এটি ভারতীয় ধর্মগুলোর সাধারণ বৈশিষ্ট্য মোক্ষ বা 'মুক্তি লাভ'

ধারণার বিরোধী।

ভারতের দার্শনিক ধারাগুলোর মধ্যে প্রাচীনতম সাংখ্য দর্শন। এটি বৈদিক ঐতিহ্য সংশ্লিষ্ট নয়। সাংখ্য দর্শনে প্রকৃতিই প্রধান। প্রকৃতপক্ষে প্রকৃতির প্রতিশব্দও প্রধান। এ দর্শনে প্রকৃতি কিভাবে অব্যক্তরূপ থেকে ব্যক্তরূপে বিকশিত হয়েছে তা বর্ণিত হয়েছে। এ পরিবর্তনের কারণ সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ প্রকৃতির এ তিন গুণের ক্রিয়া। কিন্তু সাংখ্য দর্শনে গুণগত পরিবর্তন বা নতুন গুণের উদ্ভবের ধারণাটি বিকশিত হয় নি। তাই এ দর্শন অচেতন বস্তু থেকে চেতনার উদ্ভবকে ব্যাখ্যা করতে পারেনি। এজন্য চেতনাকে প্রকৃতির বাইরের আলাদা একটি সত্তা হিসাবে কল্পনা করা হয়েছে। এ সত্তা নিষ্ক্রিয় দর্শক মাত্র। প্রকৃতির পরিবর্তনে এর ভূমিকা নেই। এ সত্তার নাম পুরুষ। সাংখ্যের পুরুষ ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে আলাদা। সাংখ্য ঘোষণা করেছেন, 'ঈশ্বর আসিদ্ধে প্রমাণাভাবৎ' (প্রমাণের অভাবে ঈশ্বর অসিদ্ধ)। কাজেই দর্শন হিসাবে সাংখ্য দ্বয়বাদী হলেও এর বস্তুবাদী দিকটি প্রধান। ভাববাদীরা সাংখ্যের এ দুর্বলতাটুকু কাজে লাগিয়েছেন। ব্যক্তি পুরুষকে তারা তাদের 'জীবাত্মা' ধারণার সাথে মিলিয়ে দিয়েছেন। ব্যক্তি পুরুষের উর্ধ্বে যে নৈর্ব্যক্তিক 'পুরুষ' বা ঈশ্বরের কল্পনা ছিল, তাকে পরমাত্মা নাম দিয়েছেন। ঘোষণা করেছেন জীবাত্মা পরমাত্মারই অংশ।

যোগব্যায়াম বা যোগাভ্যাসের নজির প্রাক্ আর্য সিন্ধু সভ্যতার পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শনেই রয়েছে। বিভিন্ন ধর্মীয় ধারা এটিকে তাদের অঙ্গীভূত করে নিয়েছে। এই যোগাভ্যাসকে সাংখ্য দর্শনের সঙ্গে যুক্ত করে গড়ে উঠেছে যোগ দর্শন। কিন্তু এ সাংখ্য আদি নিরীশ্বর সাংখ্য নয়, ভাববাদীদের দ্বারা পরিবর্তিত স-ঈশ্বর সাংখ্য। যোগদর্শন যোগাভ্যাসের চূড়ান্ত লক্ষ্য হিসাবে ঘোষণা করেছে, প্রকৃতি যে আত্মার বন্ধন তা উপলব্ধি করে আত্মার প্রকৃতি থেকে মুক্ত হওয়াকে। এভাবে যোগদর্শনে সাংখ্যের ভাববাদী দিকটিই প্রবল হয়ে উঠেছে। ধ্যানের চূড়ান্ত পর্যায় সমাধিতে আত্মার আত্মোপলব্ধি এবং পরমাত্মার সঙ্গে মিলন, এসব বিষয় যুক্তির সীমানার বাইরে। তাই এ দর্শন রহস্যবাদী (mystic)। কিন্তু যোগদর্শনের গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয় ব্যক্তির শরীর ও মন এবং প্রকৃতির সঙ্গে তার সম্পর্ক। এসব আলোচনায় যোগদর্শন বস্তুবাদী।

> ব্রাহ্মণ্য ঐতিহ্যবাহী জাতিবর্ণ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ও বিশেষত ব্রাহ্মণের আধিপত্যের বিরুদ্ধে বুদ্ধ সহ একাধিক প্রাচীন চিন্তানায়ক ও ধর্মপ্রবর্তক প্রতিবাদী আন্দোলন চালিয়েছিলেন। কিন্তু জাতিভেদ প্রথার বিলোপ ও উচ্চতর জাতির দ্বারা অন্ত্যজদের পীড়ন কোনওটিই বন্ধ হয়নি।

আস্তিক অন্য দুটি দর্শন ন্যায় ও বৈশেষিক এর সঙ্গেও বৈদিক ঐতিহ্যের সংশ্লিষ্টতা লক্ষ্যযোগ্য নয়। ন্যায় শব্দটির অর্থ যুক্তি। এ দর্শনের মূল আলোচ্য যুক্তিবিদ্যা। বিশেষ শব্দটির বিশেষণই বৈশেষিক। পৃথক সত্তা বা 'পদার্থ' সমূহই এ দর্শনের মূল আলোচ্য। ভারতীয় পরমাণুবাদের বিকাশ ঘটেছে এ দর্শনে। ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনই ভারতীয় বিজ্ঞান চর্চার দার্শনিক ভিত্তি। 'বৈশেষিক সূত্র'তে ঈশ্বর শব্দটিই নেই। 'ন্যায় সূত্র'তে তিনটি বাক্যে ঈশ্বরের সমর্থনে যুক্তি উত্থাপন ও খণ্ডন করা হয়েছে। ন্যায়-বৈশেষিকে জ্ঞান লাভের উপায় হিসাবে প্রত্যক্ষ এবং অনুমানকে গুরুত্ব দেয়া হয়। কিন্তু এতে 'শব্দ প্রমাণ' বা আপ্তবাক্য বা উন্মোচিত জ্ঞানকেও স্বীকার করা হয়। কাজেই মর্মবস্তুর দিক দিয়ে আদি ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শন বস্তুবাদী। যদিও এরা ভাববাদের সঙ্গে আপোষ করেই অগ্রসর হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আমরা আধুনিক বস্তুবাদ ও আরোহবাদের স্থপতি ফ্রান্সিস বেকন এবং জন লক্ এর কথা মনে করতে পারি। তারাও উন্মোচিত জ্ঞানের বিষয়টি প্রত্যাখ্যান করেন নি বা করতে পারেন নি। ন্যায়-বৈশেষিক এর এ বাধ্যবাধকতার বিষয়টি সহজেই অনুমেয়।

জৈন মতে পাঁচটি মূল সত্তা বা তত্ত্ব যথাক্রমে জীব (আত্মা), আকাশ (স্থান), ধর্ম (গতি), অধর্ম (স্থিতি), পুদ্গল (বস্তু)। এখানে আত্মার ধারণাটি ছাড়া অন্য চারটি ধারণাই বস্তু সম্পর্কিত এবং আত্মার উপর নির্ভরশীল নয়। এসব জৈন দর্শনের বস্তুবাদী উপাদান। জ্ঞানের প্রকৃতির ব্যাপারে জৈন দর্শন ভারতীয় দর্শনের অন্য ধারাগুলোর মতো নিশ্চয়তাবাদী নয়। তা অনেকান্তবাদী, অর্থাৎ তারা একটি বক্তব্যকে চূড়ান্ত সত্য বলে মানেন না। তারা জোর দেন বিভিন্ন বক্তব্যের সম্ভাব্যতার উপর। তাদের যুক্তিপ্রণালী স্যাদবাদ নামে পরিচিত।

ভারতীয় দর্শনের সব ধারাতেই একটি অপরিবর্তনেয় মূল সত্তাকে স্বীকার করা হয়েছে, তা ব্রহ্ম, আত্মা, চতুর্ভূত (মাটি, জল, বাতাস, আগুন), পরমাণু, পুদ্গল সে যে নামেই হোক। বৌদ্ধ দর্শনে এ সত্তাটিকে বলা হয় 'ধর্ম'। তবে এ 'ধর্ম' অপরিবর্তনেয় নয় বরং প্রতি মুহূর্তেই তা ধ্বংস হচ্ছে এবং নতুন করে সৃষ্টি হচ্ছে। তাই প্রতিটি সত্তাই ধ্বংস ও সৃষ্টির একটি ধারাবাহিকতা মাত্র। অন্য দর্শনে যেখানে স্থিতিশীলতার উপর জোর পড়েছে, বৌদ্ধ দর্শনে সেখানে জোর পড়েছে পরিবর্তনশীলতার উপর। তাই দার্শনিক দ্বান্দ্বিকতার (dialectics) বিকাশটি বেশি ঘটেছে বৌদ্ধ দর্শনেই।

বৌদ্ধ দার্শনিক ধারা একটি নয় কয়েকটি। এর মধ্যে চারটিই প্রধান। সর্বাস্তিবাদী বা বৈভাষিক ধারায় বহির্জগত এবং মনোজগত উভয়কেই সত্তাবান বলে মানা হয়েছে। বাহ্যাস্তিবাদী বা সৌত্রান্তিক ধারায় বহির্বাস্তবের সত্তাকে স্বীকার করা হয়। তবে আমরা সে সত্তাকে মনোজগতের মাধ্যমে অনুমান করতে পারি মাত্র। মনোজগত স্বতন্ত্রভাবে সত্তাবান নয়। যোগাচার বা বিজ্ঞানবাদে (ভারতীয় দর্শনে বিজ্ঞান শব্দটির অর্থ চেতনা, সায়েন্স নয়।) শুধুমাত্র মানসিক সত্তাকে সত্য মনে করা হয়, বহিস্থ জগতকে নয়। কারণবহিস্থ জগত সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান মানসিক জগতের উপরই নির্ভরশীল। মাধ্যমিক বা শূন্যবাদ বহির্জগত ও মানসিক জগত কোনটিকেই প্রকৃত সত্তাবান মনে করে না। কারণ সবকিছু যখন পরিবর্তনশীল এবং পরস্পর নির্ভরশীল, তখন এসব আছে তা বলা যায় না, আবার নাই তাও বলা যায় না। সত্তার এ বিশেষ অবস্থাটিকে তারা 'শূন্যতা' নামে অভিহিত করেন। কাজেই সত্তাতাত্ত্বিক বিবেচনায় বৌদ্ধ দর্শনের প্রথমোক্ত দুটি ধারা বস্তুবাদী, শেষোক্ত ধারা দুটি ভাববাদী। জ্ঞানের প্রকৃতি সম্বন্ধে মতবাদের ক্ষেত্রে ধারাগুলোর মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। কিন্তু জ্ঞান লাভের উপায় হিসাবে সবকটি ধারাই প্রত্যক্ষ এবং অনুমানকে মেনে নিয়েছে। বৌদ্ধ দর্শন জ্ঞান লাভের উপায় হিসাবে আপ্তবাক্যকে স্বীকার করেনি।

ন্যায় দর্শন এবং বৌদ্ধ দর্শনের সুদীর্ঘ ধারাবাহিক বিতর্কে ভারতীয় যুক্তিবিদ্যার বিশেষ বিকাশ ঘটেছে। অন্যান্য ধারার দর্শনিকেরাও এতে অবদান রেখেছেন। ভারতীয় কান্ট ও হেগেল বলে আখ্যায়িত বৌদ্ধ দার্শনিক ধর্মকীর্তির (৬০০ খ্রিস্টাব্দ) নিম্নে উদ্ধৃত বক্তব্যটি দেখুন। এতে এ কথা স্পষ্ট, ভারতীয় অনেক দার্শনিক, দার্শনিক পরিচয়ে ভাববাদী হলেও তারা আধুনিক বস্তুবাদীদের নিকট আত্মীয়। "বেদের প্রমাণতা, কোনো ঈশ্বরের সৃষ্টি কর্তৃত্ব, স্নানে ধর্মের ইচ্ছা সৃষ্টি হওয়া, জাতিবাদের দম্ভ এবং পাপ মোচনের জন্য দেহকে সন্তাপ দেওয়া, এই পাঁচটি হল মানুষের মূর্খতার সংস্কার ও জড়তার নিদর্শন।"

বিরঞ্জন রায়: মনোরোগ চিকিৎসক ও লেখক
ইমেইল: bidhanranjan@gmail.com

পরবর্তী সংখ্যায়: চার্বাক দর্শন। (তথ্যসূত্র একসঙ্গে দেয়া হবে)